পাহাড়ি গরিলার খোঁজে

দু'হাজার আট সালের মার্চে, তখনও সে-বছরের তুষারপাত শেষ হয়নি, বার্লিনের আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় আফ্রিকার রোয়ান্ডার মণ্ডপে গিয়ে সে-দেশের পাহাড়ি গরিলাদল আর সে-দেশের আদি বাসিন্দাদের দাপুটে নাচের বড় বড় ছবি দেখে মন তোলপাড় করে উঠেছিল। বিদেশিদের পক্ষে নব্বইয়ের দশকে রোয়ান্ডা ভ্রমণ কতদূর নিরাপদ, বিশেষ করে রোয়ান্ডার সাংঘাতিক জাতিদাঙ্গার জের তখনও কিছু আছে কিনা— এইসব নিয়ে যখন রোয়ান্ডার ডেপুটি পর্যটনমন্ত্রী স্টিভ মোগোৎসির সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন, তখন একফাঁকে এক রোয়ান্ডান তরুণী ছোট্ট কাগজের গ্লাসে কী-একটা ফলের রস বা হয়তো কোনও আরকজাতীয় পানীয় হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল।

সাবেকি শুভ্র পোশাকে আপাদস্কন্ধ আবৃত পর্যটন-উপমন্ত্রী আমার ভিজিটিং কার্ডে চোখ বুলিয়ে তাঁর নিজের কার্ড আমাকে দিয়ে বললেন, রোয়ান্ডায় আসার আগে আমি যেন অবশ্যই তাঁকে জানাই।

দেশে ফিরে কর্মচক্রে তাঁকে চিঠি লেখা না হলেও, রোয়ান্ডা আমার মনের মধ্যে রয়েই গেল। জঙ্গলের পাহাড়ি গরিলার ছবি আর রোয়ান্ডার মেয়ে-পুরুষের ট্র্যাডিশনাল নাচগান মাঝে মাঝেই মনে পড়ে গিয়ে ভারি অস্থির হয়ে উঠি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি, খুব বেশি করে কোথাও যাবার কথা ভাবলে, যাবার একটা উপায় বা যোগাযোগ হয়ে যায়। রোয়ান্ডার বেলায়ও তাই হল।

বার্লিনের পর্যটন মেলার বছর পাঁচেক পর 'ভ্রমণ'-এর ইন্টারনেট সংস্করণের এক নিষ্ঠাবান ও নিয়মিত পাঠকের ই-মেল এল:

ইন্টারনেটে 'ই-ভ্রমণ' আপলোড করার জন্য প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ। বর্তমানে আমি রোয়ান্ডার কিগালিতে থাকি। আফ্রিকায় আছি গত দশ বছর। 'ই-ভ্রমণ' আমাদের পক্ষে দারুণ আনন্দের। এই চিঠির মাধ্যমে একটা অনুরোধ পাঠাচ্ছি। কেউ যদি রোয়ান্ডায় এসে দেশটার বিষয়ে 'ভ্রমণ'-এ লিখতে চান, আমার দিক থেকে তাঁকে বা তাঁদের সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করতে চাই। বিশেষ করে যদি শ্রী চক্রবর্তী আসেন। তাঁকে আতিথ্য দেওয়া আমার পক্ষে হবে এক অতীব আনন্দের ব্যাপার। আমি জানি তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তবু যদি তাঁর ব্যস্ত কার্যসূচি থেকে কয়েকটা দিন বের করতে পারেন সেটা এক দারুণ ব্যাপার হবে।

শ্রদ্ধা জানবেন। ইন্দ্রনীল মৈত্র

ভ্রমণনিষ্ঠ প্রবাসী পাঠককে জানানো হল— শ্রী চক্রবর্তী রোয়ান্ডায় যেতে বহুদিন ধরে এক পা বাড়িয়েই আছেন, তবে তিনি থাকবেন হোটেলে আর কৃতজ্ঞ হবেন যদি

রোয়ান্ডার জঙ্গলে পাহাড়ি গরিলাদের কাছে যাবার পথ বা উপায় বাতলে দিতে পারেন। মধ্য আফ্রিকার ওই আদিম জঙ্গলে পাহাড়ি গরিলাদের ওপর একটা ভ্রমণচিত্র তৈরি করাই তাঁর রোয়ান্ডাযাত্রার বড় উদ্দেশ্য।

ইন্দ্রনীল মহা উৎসাহে কয়েকটা ওয়েবসাইটের হদিশ পাঠিয়ে জানাল, যাত্রার তারিখ পেলেই সে কিগালি এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে চলে আসবে।

ঠিক হল, একযাত্রায় দুই দেশ সারব। রোয়ান্ডা আর উগান্ডা। বেরিয়ে যখন পড়ছিই, তখন দু'দেশ নিয়ে দুটো আলাদা ছবি না তুলে আর ফিরছি না।

প্রথমে রোয়ান্ডার রেনফরেস্টে পাহাড়ি গরিলার খোঁজে। তারপর সেখান থেকে সোজা উগান্ডা। সময়ে কুলোলে মাঝখানে দিনকয়েক রোয়ান্ডার সীমান্ত-ঘেঁষা কঙ্গোও ঘুরে আসব। আফ্রিকার এই তিন দেশেই পাহাড়ি গরিলাদের দেখা মেলে।

বিয়ের পাকা দেখার মতো বেরিয়ে পড়ার পাকা তারিখ বলে আমার ভ্রমণ-অভিধানে কিছু নেই। তার ওপর আছে হিতৈষীদের শঙ্কাভাঁড়ার উজাড় করে অষ্টোত্তর শত নিষেধনামা। যে দেশে যাব, সে-দেশ যদি তত পর্যটনখ্যাত না হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আমার রোয়ান্ডা-উগান্ডা যাবার কথা শুনে একজন কোনওরকম ভণিতা ছাড়াই বললেন, রোয়ান্ডায় ১৯৯৪ সালে সাংঘাতিক গণহত্যায় দেশের মোট জনসংখ্যার কুড়ি ভাগ মানুষের নৃশংস মৃত্যুতে আজও সে-দেশের আনাচে কানাচে প্রতিশোধের ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। এমনও বলা হল, দিনের বেলায়ও নাকি রাস্তায় সেখানে লুটপাট চলে।

কঙ্গোয়ও যেতে পারি শুনে কয়েকজনই বললেন, সেখানে প্রকাশ্যে ছোরাছুরি-বন্দুকের লড়াই নাকি রোজকার ঘটনা।

আমার জোহানেসবার্গ, কেপটাউন, রিও-ডি-জেনেইরো ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে। জোহানেসবার্গে বলেই দেওয়া হয় বাসের জানলায়ও যদি আপনার হাত একটু বেরিয়ে থাকে, আর সে হাতে যদি দামি ঘড়ি বা সোনার চুড়ি থাকে, তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন জানলার বাইরে থেকে এক কোপে কবজি অব্দি আপনার হাত অন্যের হাতে উড়ে যাবে।

বছর বারো-তেরো আগে রিও-ডি-জেনেইরোয় প্রকাশক-সম্পাদকদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাবার আগে আমাদের বন্ধু শিবাজী, বর্তমানে বোস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর শিবাজী রাহা উপদেশ দিয়েছিলেন, রাস্তায় কয়েকজন মিলে আপনার কাঁধের ক্যামেরা বা হাতের ব্যাগ চাইলে শান্তচিত্তে দান করে দিলেই ভালো, প্রাণদানের চেয়ে সেটাই হবে অনেক কম ক্ষতিকর। ২০০৬ সালের মস্কো শহরে ক্রেমলিন প্যালেস চত্বরের সামনের বিখ্যাত ন্যাশনাল হোটেল থেকে ক্রেমলিন প্যালেসের ঐতিহাসিক হল-এ আমাদের বিশ্ব-সম্পাদক সম্মেলনে যেতে হয়েছিল। রোজ সকালে সাত মিনিটের রাস্তা হেঁটে পার হবার সময় কাছাকাছি সাদা পোশাকের পুলিশ থাকত। এতটা মারাত্মক না হলেও মাদ্রিদ-রোম-ভেনিসের রাস্তায় কেপমারির কথাও হয়তো অনেকেই জানেন।

অজানা দেশের দিকে পা বাড়িয়ে, এসব বাধা-ভয় আমার মনে আসে না। আমার আসল সমস্যা, সামনে-পিছনে সব কাজের শেকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার ফাইনাল

তারিখ ঠিক করা।

শেষ পর্যন্ত বারদুয়েক বদলের পর রোয়ান্ডার চূড়ান্ত তারিখ স্থির করা গেল। কিগালিতে সেইমতো ঊষাকালে অবতরণের কথা জানিয়ে, ইন্দ্রনীলকে বিমানবন্দরে আসতে নিরস্ত করার ভালোমতোই চেষ্টা করা গেল।

দিনকয়েক পর মার্চের ১১ তারিখে বার্লিনের মেলায় জড়ো করা রোয়ান্ডা-উগান্ডার যাবতীয় পর্যটন-পুস্তিকা নিয়ে শেষরাতের বিমানে উঠে দোহা হয়ে পরদিন ভোরবেলা কিগালি এয়ারপোর্টে নামলাম। কাউন্টারে ষাট মার্কিন ডলার দিয়ে ভিসা নিয়ে বাইরে এসে দেখি, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাঙালি তরুণ— এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রনীল, আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তার গাড়িতে তুলে প্রথমেই আমাকে শহরের অফিস-পাড়ায় রোয়ান্ডা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে দুটো-একটা ফর্ম পূরণ করে ওই সাতসকালে পাঁচশো ডলার দিয়ে গরিলা পারমিট হাতে-হাতে পেয়ে গেলাম।

'কাল ভোরেই আপনি বেরিয়ে পড়বেন রোয়ান্ডান রেনফরেস্টে গরিলা ট্র্যাকিংয়ে। তার আগে আজকের রাতটা শুধু একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে।' ইন্দ্রনীলের স্পষ্টোক্তি শুনে নিশ্চিন্তই হওয়া গেল।

রোয়ান্ডায় মোট নাকি চারটি বাঙালি পরিবারের বাস। ইন্দ্রনীলের অতিথিকে দর্শন করতে বাকি তিনটি পরিবার সন্ধ্যায় তার বাড়িতে দর্শন দিলেন। রোয়ান্ডার সেই বঙ্গ সম্মেলনে পাঁচ মুখে দেশটার পাঁচ কথা শুনে, সেখানকার অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ, তাদের অভ্যাস-সংস্কারের দু'চার কথা জেনে রোয়ান্ডার প্রথম দিনটা ভালোই কাটল। ভালো লাগার আরও একটা বড় কারণ— সেদিন বিকেলে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে রোয়ান্ডার হস্তশিল্পের পাড়ায় ঘোরা। সেখানে যাবার সময় রাস্তার ধারে বিশাল গরিলামূর্তি আমার মনে রোয়ান্ডার ধ্রুবপদ ধরিয়ে দিল। গরিলা বোধহয় সেই কোন আদিকাল থেকেই এখানকার মানুষের যমজ ভাই বা বোন।

রাতে ইন্দ্রনীলের গৃহকর্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় তেলাপিয়ার কালিয়া সহযোগে বাসমতী ভাত খেয়ে যেই খেয়াল হল কালই ভোরে একশো কিলোমিটার দূরে কিনিগির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হবে, সেটাই জঙ্গলের প্রবেশপথ, অমনি পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর গলায় আটকে যাবার জোগাড়। গত পরশু মধ্যরাতে গৃহত্যাগ করে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শেষরাতের বিমানে দোহা, পরদিন দোহা থেকে বুখারেস্ট ছুঁয়ে আজই সকালে কিগালি নেমেছি, কাল আবার ভোরে উঠেই যাত্রা। কিনিগি পৌঁছে সেখান থেকে যাব জঙ্গলে, গরিলাদের খোঁজে জলে-কাদায় সারাবেলা চিরপ্যাঁচপেচে প্রাচীনকালের এক মহারণ্যে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হবে ভেবেই আমার মাথা ঘোরার অবস্থা।

সকালে বিমানবন্দর থেকে সোজা গরিলা পারমিটের ব্যবস্থা করতে চলে আসায় তখন মনে মনে ইন্দ্রনীলের বুদ্ধি ও তৎপরতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন রাত নামতেই তার মাশুল গুনতে গিয়ে ভিরমি খাবার জোগাড়। রাত না-কাটতেই সারা দিনের মতো বেরিয়ে পড়া। তারপর কিনিগি পৌঁছে আফ্রিকার এক আদিম অরণ্যে গরিলার খোঁজে সারা বেলা! একেবারে একা-হাতে ক্যামেরা ক্যাসেট ব্যাটারি সামলে গরিলার

ছবি তুলতে হবে! সে জঙ্গলও কিগালি থেকে একশো কিলোমিটার দূর!

উদ্বেগ থেকে উদ্ধার করতে আসরে নামলেন সেদিনের অতিথিবৃন্দের একজন। রোয়ান্ডার বাঙালি স্থপতির ঘরনি, সেখানকার বড় কোনও মিশনারি স্কুলের শিক্ষিকা বা প্রধান। তাঁরই উদ্যোগে ধাপে ধাপে ছোট থেকে মাঝারি থেকে বড় সরকারি কর্মকর্তাদের সান্ধ্য অবসরে বারবার চূড়ান্ত ব্যাঘাত ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত একশো ডলার জরিমানা কবুল করে সমস্যার সুরাহা করা গেল। কালকের বদলে তার পরদিন জঙ্গলে ঢোকার সরকারি অনুমতি মিলল। সেইমতো পরদিন সকালেই রোয়ান্ডা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অফিস থেকে ইন্দ্রনীল প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়ে আনল। দেখে ভালো লাগল, প্রয়োজনে দণ্ড দিলাম, কিন্তু ঘুষ দিতে হল না। পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখেছি ঘুষশিল্প ফুলেফেঁপে উঠেছে, বিশেষ করে সোভিয়েত-ভাঙা বেশ কয়েকটি দেশে এ নিয়ে মানুষের মনস্তাপ ও কবি-শিল্পী-শিক্ষক-সাংবাদিকদের ক্ষোভ তো আমি নিজেই দেখেছি। রোয়ান্ডায় শুনলাম নতুন প্রেসিডেন্ট পল কাগামে দুর্নীতি দূরীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বহুমুখী তাঁর সক্রিয়তা। একটা সহজ নিয়ম এখানকার মানুষের মুখস্থ হয়ে গেছে, ঘুষ যে দেবে আর ঘুষ যে নেবে দু'জনকেই শূলে চড়ানো হবে। এ নিশ্চয়ই আমাদের কবিগুরুর 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'র প্রেসিডেন্ট-কৃত কালোচিত সম্প্রসারণ ও সমুচিত প্রযোজনা। আমি জানতাম না, রোয়ান্ডার সর্বত্র, হোটেলে রেস্তোরাঁ অফিসে এই জনপ্রিয় প্রেসিডেন্টের ছবি টাঙানো থাকে। মুখটা দেখতে আমাদের জ্যাঠাবাবু বা বড় মেসোমশাই বা বড়মামার মতো। কয়েক জায়গায় এই মানুষটির একই রকম ফটো দেখে শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে ইনিই এদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি।

যাই হোক, কিগালিতে বাড়তি একদিন পেয়ে ধীরে-সুস্থে পরদিন ভোরের কিনিগি যাত্রার সব ব্যবস্থা করে ফেলা গেল। ইন্দ্রনীলের মধ্যস্থতায় দৈনিক চল্লিশ হাজার না ষাট হাজার রোয়ান্ডার টাকায় (বোধহয় ষাট মার্কিন ডলারে) ড্রাইভারসুদ্ধ গাড়ি ঠিক হয়ে গেল। তেল-খরচ বাবদ আলাদা আরও চল্লিশ বা ষাট হাজার আগাম দিয়ে পরদিন বেলার দিকে বেরিয়ে পড়লাম কিনিগির উদ্দেশে। ওখানকার গরিলা মাউন্টেন ভিউ লজ হোটেলে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোর ভোর সোজা ভলকানোজ ন্যাশনাল পার্ক। সেখানেই রোয়ান্ডার আদিম অরণ্যের শুরু, এই কিনিগি সেই জঙ্গলে ঢোকার রাস্তা। কালই আমি ওই মহাপ্রাচীন জঙ্গলে যেতে পারব, হেঁটে হেঁটে খুঁজে বেড়াব এই অরণ্যের পাহাড়ি গরিলা— একথা যত ভাবি ততই মনে অদ্ভুত একটা আবেগ উথলে ওঠে।

গরিলা মাউন্টেন ভিউ লজ হোটেলে পৌঁছতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। আমার সুটকেস, ক্যামেরা ইত্যাদি যত্নে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার জানাল, কাল ঠিক ভোর পাঁচটায় সে এখানেই চলে আসবে, আমাকে কিনিগিতে রোয়ান্ডা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে নিয়ে যাবে।

রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই হোটেলে আমার নামে কোনও ঘর বুক করা নেই। একটু আশ্চর্যই হলাম, কেননা ইন্দ্রনীল আমার সামনেই ফোনে এই গরিলা ভিউ লজে আমার ঘর বুক করেছে। রিসেপশনের রোয়ান্ডান তরুণীর বিশ্বাস

কিনিগিতে গরিলা দর্শনার্থীদের থাকার জন্য আরও বড় একটা হোটেল আছে, তার নাম মাউন্টেন গরিলা ভিউ লজ, হয়তো সেখানে আমার বুকিং আছে। ভলকানোজ ন্যাশনাল পার্কের কিছুটা কাছে সেই হোটেল। ড্রাইভার নিশ্চয়ই ভুল করে এই হোটেলে নিয়ে এসেছে।

গরিলা মাউন্টেন ভিউ হোটেল থেকে বেরিয়ে চললাম মাউন্টেন গরিলা ভিউ হোটেলে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, হঠাৎ চারদিক কালো করে প্রবল বৃষ্টি। সঙ্গে অন্ধকার-চাবকানো বিদ্যুৎশিখা আর হৃদস্পন্দন থমকানো বজ্রপাত।

পাহাড়ি রাস্তা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী, একদিক নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে ঢাকা, আর একদিকে গভীর খাদ, সেও বোধহয় এক আদি বৃক্ষযুগের ধারক। ভয়াবহ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটার পর একটা পাহাড়ের অন্ধকার বাঁকও যেন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

গাড়ির চালকের স্নায়ুতন্ত্রেও নিশ্চয় ঝড় চলছে, তার চাপ আমি শুধু কিছুটা অনুমানই করতে পারি। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বসে গাড়ির ভিতরেই প্রবল টাল সামলাতে সামলাতে সারা দেহে-মনে হঠাৎই যেন আদিমকালের আফ্রিকার আলিঙ্গন পেলাম। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে আগেও বারকতক এসেছি, কখনও আমার এরকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়নি।

হোটেলের সামনে যখন গাড়ি থামল, তখনও জলবৃষ্টি তার পূর্ণ দাপট নিয়ে যেন ভুবন তোলপাড় করছে। বড় বড় দুটো ছাতা নিয়ে দীর্ঘদেহী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলশালী দু'জন লোক এসে আমাকে গাড়ি থেকে খুবই সতর্কভাবে ভিতরে নিয়ে গেল। বিরাট লাউঞ্জের একধারে রিসেপশন। সেখানে কর্তব্যরত রোয়ান্ডান তরুণীকে আমার নাম বলতেই হাসিমুখে ঘরের চাবি আমার হাতে দিল।

এবার দু'জন ছত্রধরের একজন আমাকে ও আরেকজন আমার বড় সুটকেস ও ক্যামেরা হিংস্র-বৃষ্টি বাঁচিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল। ততক্ষণে আরও একজন আরও একটা ছাতা নিয়ে এসেছে। বনজঙ্গলময় প্রাকৃতিক পরিবেশে দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা একেকটা বাঁকে এক-একজোড়া কটেজ। নীরবে ও ধীরে-সুস্থে, শান্তভাবে তিনজন আমাকে প্রায় ঘিরে নিয়ে বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে আমার নির্দিষ্ট কটেজের দিকে এগিয়ে চলল। জলছপছপ স্নিকার পায়ে উরু অব্দি ভেজা প্যান্টের শীতল ছ্যাঁকা সয়েও বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

আমার জন্য বরাদ্দ কটেজ একেবারে শেষ প্রান্তে। কটেজের তিনদিকে ঘন জঙ্গল। সামনের উঠোনের গোড়ালিজলে ছপছপে স্নিকার আরও জলবাহী করে ঢাকা বারান্দায় উঠে মনে নানা সংশয়।

বিশাল চাবি দিয়ে আরও বিশাল তালা খুলে আমাকে ঘরের টর্চ, মোমবাতি, ঘরে পরার ভারী চপ্পল, বাথরুম, তোয়ালে ইত্যাদি বুঝিয়ে দিয়ে তারা চলে গেল।

ভেজা জুতো-জামা খুলে তোয়ালে দিয়ে ঘষে গা-মাথা শুকোতে ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল। তারপর রবারের মোটা চপ্পল পরে ডিনারের জন্য ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে চক্ষু চড়কগাছ। সামনের উঠোন বর্ষার পদ্মা, নিদেন আমাদের আষাঢ়ের মাতলা। এই ধরনের আরণ্যক আবাসে পরিবেশ রক্ষায় সাধারণত বিদ্যুতের ব্যবস্থা

থাকে না। এখানে বিদ্যুৎ হয়তো দুর্লভও, শুধু ভোরে, দুপুরে আর সন্ধেরাতে বাঁধা কয়েক ঘণ্টার জন্য জেনারেটর চলে। টেলিফোনের খোঁজে ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করলাম ফোনই নেই। কলিংবেলের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাছাকাছি একটা কোনও মনুষ্যমূর্তি চোখে পড়বার সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই নেই।

ঝমঝমে বৃষ্টি এখন ঝিরিঝিরি। হঠাৎ দু'-একটা বিদ্যুচ্চমকে চারদিক দেখে দমে যাই। একটা ভরসা, রিজার্ভেশনের যে মহিলার সঙ্গে ফোনে ইন্দ্রনীল হোটেল বুক করেছে, তার নামটা মনে পড়ল— ইসাবেলা। লাগতে পারে ভেবে তাঁর মোবাইল নম্বর ইন্দ্রনীল আমাকে লিখে দিয়েছিল। ভেজা প্যান্টের পকেট হাতড়ে জলে অস্পষ্ট সেই নম্বরে আমার মোবাইল থেকে ফোন করে জানা গেল ফোন সুইচড অফ। ইন্দ্রনীল যদি হোটেলের কাউকে ফোনে খবর দিতে পারে সেই আশায় কিগালিতে ওর নম্বরে ফোন করে জানলাম এ-নম্বরে ওর ফোন যায় না। এ আশ্চর্যের রহস্যভেদে কালক্ষেপ না করে আরও একবার বারান্দা থেকে আর্ত ডাক ছাড়তে লাগলাম। কখনও একহাতে কান চেপে, কখনও দু'হাতের তালু মুখের কাছে মাইকের মতো ধরে 'কেউ কি এখানে আছেন?' 'কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন?' বলে ইংরেজিতে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল, হোটেলের নিয়মকানুন ও গরিলা-দর্শনেচ্ছু জঙ্গলযাত্রীদের অবশ্য-পালনীয় রীতি-নীতি ছাপানো একটা কাগজ দিয়েছিল রিসেপশনের কৃষ্ণকলি, মাথায় হোটেলের নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর হয়তো দেখেছি।

সত্যিই তাই, হোটেলের সেই নম্বরে বারবার ফোন করে শেষ পর্যন্ত এক ভদ্রলোকের সাড়া পাওয়া গেল। আমার কটেজের সামনে জলের বিপদসীমা লঙ্ঘনের বিশদ বর্ণনার উত্তরে জানালেন, উই আর কামিং টু ইউ, স্যর। এত শান্ত স্বরে কথাটা বললেন যে, বারকতক 'রিপিতে, সিল ভু প্লে', 'পার্‌দোঁ মসিও' বলে ভালো করে তাঁর কথাটা শোনার পর তবেই জলবেষ্টিত আমার হৃদয়ঙ্গম হল, কেউ তাহলে আমাকে উদ্ধার করতে আসছে! অনেকক্ষণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দূরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল কাঠের একটা বড় খাট চারজনে মিলে জলে ঢেউ তুলে মাথায় করে বয়ে আনছে। তার পিছনে আরও কয়েকজনের মাথায় আর একটা খাট। তার পিছনে আরও দু'জন কোমরজল ভেঙে এগিয়ে আসছে। আন্দাজে মনে হল তাদের মাথায় স্কুলের হাই বেঞ্চ।

প্রথমে বড় খাটটা পাতা হল বারান্দার তিন ধাপ সিঁড়ির মাথায় লাগিয়ে, কিন্তু সিঁড়ির মাথা ছাড়িয়ে। যাতে বারান্দা থেকে জলে ডোবা সিঁড়ির মাথা আমি লাফিয়ে পার হতে পারি। লাফিয়ে নামব গিয়ে সোজা খাটের ওপর। খাট দিয়ে গটগট করে হেঁটে গিয়ে পা রাখব পরের খাটের ওপরে রাখা একটা জলচৌকিতে। জল সেখানে আরও গভীর, ফলে দ্বিতীয় খাটের ওপরে এই জলচৌকির ব্যবস্থা। এবার প্রথম খাটটা তুলে নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে রাখা হল দ্বিতীয় খাটের পিছনে। সেখানে কোমরজল, আমি সরাসরি পা রাখলাম। তারপর হাই বেঞ্চ। এইভাবে পরপর টেবিল, হাই বেঞ্চ পার হয়ে ডাইনিং হলে যখন পৌঁছলাম তখন সেখানে, সেই বিশাল হলের মধ্যে শুধু শ্বেতকায় এক তরুণ দম্পতি, যতদূর মনে হয় হানিমুন কাপল,

খাবার সামনে রেখে পরস্পরের চুম্বনসুধা পানে বিশ্ববিস্মৃত। এই দু'জন মনে হয় আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলা দেখতে নয়, মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যই এসেছে। সত্যিই তো, আফ্রিকার আদিম জঙ্গল যেমন বন্যপ্রাণের স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র, তেমনই মধুচন্দ্রিমার স্বর্গরাজ্যই বা হবে না কেন?

কিচেন বন্ধ হবার মুখে কোনওরকমে রোয়ান্ডার বিখ্যাত পদ রোজমেরি-তেলাপিয়া প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হল। বোধহয় আধসেরি একটা তেলাপিয়া মাছ রোজমেরির সস বা গ্রেভির ওপর শোয়ানো। একপাশে ছোট্ট একটা বাটির মাপে সাদা ভাত। মাছ নুন-মশলা সহযোগে তেলে ভেজে সসের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে। খেতে সুস্বাদু, তার ওপর যথেষ্ট খিদে তো ছিলই।

রিসেপশনে রাত চারটেয় ঘুম ভাঙাতে বলে খাট-টেবিল-হাইবেঞ্চের পথে এবার উল্টো রথযাত্রা।

ঘরে ঢুকে প্রথম কাজ কাল ভোরে বেরোবার জন্য উপযুক্ত গরম পোশাক, ক্যামেরা, ব্যাটারি ইত্যাদি গুছিয়ে ফেলা।

এখনই শীত করছে, ভোরে শুনেছি তাপমাত্রা পাঁচ-সাত ডিগ্রি নেমে যায়। অতএব আপাদকণ্ঠ উলের অন্তর্বাসও ঘরের হিমভাব থেকে বাঁচাতে পাশের বিশালাকার বাড়তি দুটো বালিশের নীচে চাপা দিয়ে রাখলাম।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দরজায় রহস্যময় ঠকঠক শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ঠকঠক বেড়েই চলেছে। ঘুমের ঘোরেই লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দেখি মশাল হাতে সাক্ষাৎ ডাকাত সর্দার!

'ইওর ওয়েক আপ কল, স্যর!'

হাতের আলোকদণ্ডটি না থাকলে বিশাল চেহারার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বক্তাটিকে অন্ধকারে আলাদা করাই যেত না। মশালটিও যে ঠিক মশাল নয়, সেটা বুঝতেও কয়েক মুহূর্ত লাগে।

জেনারেটর চালু হয়েছে, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই বাথরুমে হট ওয়াটার পাওয়া যাবে জানিয়ে লোকটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ঘরের কাচের জানলা দিয়ে শুধু তার মাথার ওপর ভাসমান আলোকদণ্ডটির চূড়া দেখতে পেলাম।

গিজারের জল গরম হতে বেশ সময় লাগছে। যতবারই বেসিনের কল খুলে পরখ করতে যাই, ঠান্ডায় আঙুল যেন বরফছ্যাঁচা। এমনিতেই এখানে ভোরের শীত সহনস্তরের ঢের নীচে। আসলে রোয়ান্ডার এই উত্তরাংশ পুরোটাই পার্বত্য অঞ্চল। রোয়ান্ডা দেশটাকেই তো বলা হয় 'হাজার পাহাড়ের দেশ'।

স্নান সেরে পরতে পরতে পোশাক চড়াতে একটু বেশিই সময় লাগল। ব্রেকফাস্টের টেবিলে পৌঁছে দেখি আমার সারথি দুই টেবিল দূরে খাওয়া শেষ করে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমারই পথ চেয়ে বসে আছে।

সময়াভাবে আমাকে ফলাহারে সন্তুষ্ট হতে হল। গরম দুধে কর্নফ্লেক ঢেলে তাতে একজোড়া মোটাসোটা রোয়ান্ডার কলা চাকাচাকা করে কেটে দিয়ে দিব্যি দেবভোগ্য প্রাতরাশ খাওয়া হল।

কিনিগিতে রোয়ান্ডা উন্নয়ন বোর্ডের অফিসে গরিলা পারমিট দেখাবার সময়

উদ্দাম নৃত্যগীতের আওয়াজে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। একটু এগিয়ে দেখি এবড়ো-খেবড়ো পর্বতশৃঙ্গমালার পায়ের কাছে খোলা জায়গায় একদল নারী-পুরুষ আকাশ-বাতাস মাতিয়ে নাচগানে মেতে উঠেছে। সাবাইয়িনো পাহাড়ের নীচেই রোয়ান্ডার এই ঐতিহ্যশালী দুর্দান্ত নৃত্যগীত।

সাবাইয়িনো কথাটার বাংলা মানে আর করে দিতে হয় না, পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো চূড়াগুলোই এর বাংলা অনুবাদ— বুড়ো মানুষের দাঁত। বৃদ্ধবয়সে অর্ধেকই পড়ে গিয়ে যেমন দেখায়, পাহাড়ের মাথার দিকটা ঠিক তেমনই। সাগরপিঠ থেকে এ-পাহাড়ের উচ্চতা ৩,৬৭৪ মিটার। আমার খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে গোড়ায় দু'-একটা নাচগান আমার দেখা হল না।

সাবাইয়িনো পাহাড়ের ডানদিকেই আরও দু'টি পাহাড় আছে, গাহিঙ্গা আর মুহাবুরা, শুধু শুনেছি, এখনও তাদের চোখে দেখিনি। এই তিন পাহাড়ের পিছনে কুয়াশায় আর দূরত্বে ঝাপসা রোয়ান্ডার বিখ্যাত ভিরুঙ্গা পর্বতশ্রেণি, ভলকানোজ ন্যাশনাল পার্ক ভিরুঙ্গার রোয়ান্ডার অংশ আগলে রেখেছে।

এখান থেকে আরও খানিকটা গাড়িতে জামঝাঁকানি সয়ে সেই ভলকানোজ পার্কের রেনফরেস্টের সীমারম্ভে পৌঁছতে গাড়ি থেকে নেমে আরও প্রায় আধঘণ্টা হাঁটতে হল। বিস্মরণের অযোগ্য উঁচুনিচু পথ, জল-কাদায় পিচ্ছিল, মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে মাটিতে আধপোঁতা পাথরের চাঁই। সবশেষে জঙ্গলে পাথুরে বেড়া ছাড়াও পাহাড়ি নালা-বেষ্টনী। বেড়া ডিঙিয়ে, নালা পেরিয়ে তবেই জঙ্গলে প্রবেশ।

বেড়া ও নালার সামনে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আরও চার দল জঙ্গলযাত্রী অপেক্ষা করছে। একেক দলে ছ'জন করে গরিলা-সন্ধানী। প্রত্যেক দলে একজন করে গরিলা-বিশেষজ্ঞ। প্রত্যেকেই সঙ্গে বিশ-পঁচিশ ডলারে একজন করে ব্যক্তিগত সহায়ক নিয়েছে, ছাতা, ব্যাগ-ট্যাগ বওয়া, কী জঙ্গলের পথে খানাখন্দ বাতলানো এদের কাজ।

আমাদের সামনে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত দু'জন নিরাপত্তারক্ষী। শুনলাম আমাদের সঙ্গেই জঙ্গলে ঢুকবে। তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি চোরাশিকারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণ বাঁচান, নাকি জঙ্গলে গাছচুরি কাঠচুরি আটকান? রোয়ান্ডান ভাষায় উত্তর ইংরেজি করে দিলেন গরিলা-বিশেষজ্ঞদের একজন। বাংলা করলে দাঁড়ায়, এরা আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে যাবে বন্যমহিষের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে। বন্যমহিষ খেপলে সে নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার!

চব্বিশজন অভিযাত্রীর জন্য মাত্র দু'জন রক্ষাকর্তা, তাও আবার চার দল এই মহারণ্যের চারদিকে ছড়িয়ে গরিলার খোঁজে ঘুরবেন, মাত্র দু'জন কীভাবে সকলকে রক্ষা করবে ভেবে পেলাম না। বন্যমহিষ কেন খামোখা খেপে উঠবে, আমাদের সঙ্গে তার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবেই বা কী করে ভেবে না পেয়ে আমি নির্ভয়, নিশ্চিন্ত হলাম। নিশ্চিন্তির আরও একটা কারণ, কেনিয়া তাঞ্জানিয়ার সাভানা অঞ্চলে বিশালকায় কয়েকশো বুনোমোষ সার বেঁধে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, ছবি তুলতে তুলতে তাদের ভয়াবহরকম স্থির দৃষ্টিও দেখেছি, কিন্তু কেউ কখনও আমার দিকে

তেড়ে এসেছে বলে মনে পড়ে না।

কতকালের প্রাচীন আফ্রিকার সেই ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গল! জঙ্গলে ঢোকার মুখে আমাদের ছ'জনের দলের জন্য নির্দিষ্ট একমাত্র গরিলা-বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিলেন, জঙ্গলের দুর্গম পথে সাহায্যের জন্য প্রত্যেকেরই একজন করে ব্যক্তিগত গাইড সঙ্গে থাকা দরকার। তাছাড়া বেলার দিকে যখন গরমে শীতের পোশাক-টোশাক খুলে ফেলতে হবে সেগুলো বইবার জন্যও এই ধরনের গাইড নেওয়া উচিত।

শুনলাম, ব্যক্তিগত গাইডের ফি পঁচিশ-তিরিশ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ডলার। জঙ্গলে ঢোকার অনুমতিপত্রের জন্য পাঁচশো ডলারের ওপর শুধু তারিখ বদলাতেই আরও একশো ডলার গচ্চা গেছে। তারপরও আরও ডলার! আমি জানালাম যে, ওই গাইড ছাড়াই আমার চলবে। ছ'জনের দলের পাঁচজন নানা দামে মাথাওলা বুদ্ধিমান পাঁচটি গাইড বেছে নেবার পর দেখা গেল একটা তালঢ্যাঙা লোক কাতর দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, একবার গরিলা-বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে থাকছে।

গরিলা-বিশেষজ্ঞ তরুণ কী বুঝে বলল, আপনি দশ-পনেরো যা হোক দেবেন, এরকম একজন না থাকলে জঙ্গলে খুবই অসুবিধা। মাথার কাছেই বিরাট বিরাট গাছের নিচু ডাল, মাটির ওপর উঁচনো শেকড়, তার ওপর পথের জল কাদা পাথর! ধাক্কা লাগা, হোঁচট খাওয়া বা পড়েটড়ে যাওয়া থেকে এই গাইডই আপনাকে বাঁচাবে।

আমার সংশয়, তাহলে এত সস্তায় কেন?

গরিলা-বিশেষজ্ঞ কাছে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে জানায়, এ হল হুটু সম্প্রদায়ের, টুটসিদের তো আগেই সবাই নিয়ে নিল। টুটসিরা মাথাওলা, বুদ্ধিমান।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি রোয়ান্ডায় জাতিদাঙ্গায় এই সংখ্যালঘু টুটসিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হুটুরাই নৃশংসভাবে হত্যা করে। সত্য-মিথ্যা নির্ভুল জানা হয়নি, এর নাকি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, টুটসিরা মাথাওলা, অধিক শিক্ষিত, সরকারি ও অন্যান্য কাজে এরাই বেশি সুযোগ পায়। হুটুরা মাথামোটা, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া, সেই আর্থসামাজিক দ্বেষ থেকে ওই ব্যাপক গণহত্যা।

এই পড়ে থাকা হুটু গাইড এতটাই অযোগ্য যে দশ ডলারেই শেষ পর্যন্ত আমার মোট বইতে রাজি। তাও নগদে না, ঠিক হল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে টাকা দিতে পারব।

সস্তার তিন অবস্থা, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী— এসব তখন আমার মনেই আসেনি। ঘোর জঙ্গলে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাড়ে-হাড়ে শুধু নয়, ঘাড়ে-মাথায়ও বুঝলাম। দিনের শেষে এভাবেই আমার মনে আরও একটা নতুন প্রবচনের জন্ম হল— ভোঁতাবুদ্ধি ভয়ংকরী।

জঙ্গলে প্রথমেই একটা খরস্রোতা নালা। দূরে দূরে কতগুলো পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে পেরতে হবে। কোন পাথরখণ্ড থেকে কোনটায় পা রাখা তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ, সেটা অন্য গাইডদের মতো এ-ও নিশ্চয় জানে। তার সাহায্যের যখন খুব দরকার তখন প্রবল জলরাশির কলরোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আশপাশে কোথাও আমার গাইডকে দেখতে পেলাম না। যখন দেখলাম তখন সে নালা পার হয়ে অনেক দূরে নিশ্চিন্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে। একাই প্রায় তীরে এসেও শেষ পর্যন্ত ভুল পাথরে পা

ফেলে নালায় আছাড় খেয়ে যখন ওপারে পৌঁছলাম, তখনও দেখি সে নির্বিকার হেঁটে চলেছে। একবার গাছের বিশাল মোটা ডালে ধাক্কা লেগে মাথা ঘুরে পড়বার জোগাড়, বহু কসরতে হাতের ক্যামেরা বাঁচিয়েছি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত গাইড কোথায়? আপনমনে দূরে হেঁটে যাচ্ছে!

এ দুর্ভোগের এক অক্ষরও বানানো নয়, বরং খুব সংক্ষেপে বলা।

১৯৬২ সালে ভলকানোজ ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষিত মধ্য আফ্রিকার রোয়ান্ডায় এই আদিম অরণ্যে, পাহাড়ি গরিলাদের আদি বাসভূমে তাদের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্রে সেই বিপন্ন প্রজাতিরই কাউকে কাউকে খুঁজতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগত সহায়কের সরল নির্বুদ্ধিতায় আমিই বিপন্নবোধ করতে লাগলাম। কথা ছিল পথের জল-কাদা, উঁচিয়ে থাকা শেকড়, পাথর, গাছের বিপজ্জনক ডালপালা, লতাগুল্মের জট থেকে বাঁচাতে সে আমাকে আগাম সতর্ক করবে। আমিও অতএব শত পথকষ্ট সয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ একজায়গায় মস্ত মোটা একটা গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে কাদায় পড়ে গেলাম। মুহূর্তে শয়ে শয়ে লাল পিঁপড়ে আমার গায়ে-পায়ে-হাতে মুখে যেন তেড়ে এল। আমাকে পড়ে যেতে দেখে আমাদের দলের অন্য একজন ব্যক্তিগত সহকারী দৌড়ে এসে আমাকে প্রায় হ্যাঁচকা মেরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজেই দু'হাতে আমার গায়ের পিঁপড়ে ঝাড়তে লাগল। আমার লোকটি তখনও বেশ খানিকটা দূরে হেঁটে চলেছে। অন্যের সহায়ক যুবকটি হাঁক পেড়ে তাকে ডেকে এনে তাদের ভাষায় ক্রুদ্ধ স্বরে তাকে কিছু বলার পর সে-ও আমার পোশাকের পিঁপড়ে ঝাড়তে হাত লাগাল। তারপর আমাকে ইংরেজিতে জানাল, পিঁপড়ের দল দু-তিন মিনিট কামড়ালেও সারা গা ডুমোডুমো করে দেবে, চামড়ায় সাংঘাতিক জ্বালা ধরবে, জ্বরও হতে পারে। টুটসি গাইড ইংরেজি বলতে ও বুঝতে পারে দেখে আমার কয়েকটি নির্দেশ আমার হুটু গাইডকে ওর ভাষায় বুঝিয়ে দিতে বললাম। তার মধ্যে একটা ছিল সে যেন আমার সামনেই পাঁচ ফুটের মধ্যে থাকে। যাতে সামনে গাছের নিচু ডাল বা উঁচু শেকড় দেখলে আমাকে আগে থেকে সতর্ক করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যে-কে-সেই। জঙ্গলে ছবি খুঁজি, না ওর দিকে নজর রাখি! আগের মতোই সে দূরে দূরে। হাতে লম্বা দা দিয়ে মাথার ওপরের নিরাপদ লতাপাতা আর নীচের নির্দোষ নরম ঘাসজঙ্গল নির্বিচারে ছাঁটতে ছাঁটতে এগিয়ে চলেছে।

আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডান কপাল মোটা একটা গাছের ডালে জোর ঠুকে গিয়ে আমার মাথা ভোঁভোঁ করে উঠল। অন্যের সহকারীটি তখনও আমার কাছাকাছি আছে দেখে তাকেই ইশারায় ডেকে আমার লোকটাকে ডাকতে বললাম।

এবারও তাকে তার ভাষায় তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ভালো লোকটা চলে গেল। উপদেশের ফল দেখে চমৎকৃত হতে হল। একজায়গায় দেখি পঞ্চাশ-ষাট বা হয়তো সত্তর হাত দূরে লোকটা রাস্তা জোড়া একটা উঁচু গাছের ডালের সামনে দাঁড়িয়ে হাতের লম্বা দা উঁচিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। বুদ্ধি গজিয়েছে দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। কাছে গিয়ে দেখি রাস্তা এপার-ওপার করা ডালটা ওর কোমরসমান, অর্থাৎ আমার বুকসমান উঁচু। আমি ডালটার তলা দিয়ে চলে গেলাম।

তার বুদ্ধির আরও একটা চমক দেখতে হল। কিছুটা দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে

গরিলাদের প্রিয় একটা গাছের নরম শাখা কেটে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেটা আকাশে তুলে নাড়িয়ে চলেছে।

এরপর যখন আরেকটা পাহাড়ি ঝোরা পার হতে গিয়ে প্রায় কিনারে পৌঁছেও পিছল পাথরে পা দিয়েই বেমক্কা পড়ে গেলাম, কোমর অব্দি স্রোতে, ঊর্ধ্বাঙ্গ কাদায়, তখন আমাকে উদ্ধার করতে দলের অন্য সদস্যদের দু'জন সহায়কের সঙ্গে সেও হাত লাগিয়েছিল। তার বুদ্ধি না থাকতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের তিলেক অভাব নেই।

দলের গরিলা-বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যেই কয়েকবার দাঁড়িয়ে পড়ে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা বা আশা করছে দেখে আমরাও সবাই চুপ করে যাই। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোথাও কিছু না ঘটায় আবার আমাদের পথচলা শুরু হয়।

জঙ্গলে ঢোকার আধঘণ্টার মধ্যে সকালের ঠান্ডা ধুয়ে-মুছে গরম লাগতে শুরু করেছে। ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট ও সোয়েটার খুলে আমার সহায়কের হাতে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ওয়াটার প্রুফটা চাইতে গিয়ে দেখি, লোকটা ভারি যত্ন করে জ্যাকেটের হাতা দুটো কোমরে বেঁধে জ্যাকেটটা তার পিছনদিকে ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছে।

একসময় বৃষ্টি ধরে এল। ক্লান্ত হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ গরিলা-বিশেষজ্ঞ মুখে আঙুল তুলে সবাইকে নীরব থাকার নির্দেশ দিলেন। জঙ্গলের মধ্যে খানিকক্ষণ স্ট্যাচু হয়ে থাকার পর আবার শুরু হল পথচলা, এবার সম্পূর্ণ নিঃশব্দে।

হঠাৎই সামনে পাঁচ-সাতটা গরিলা দেখে দম যেন বন্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণের সব ক্লান্তি নিমেষে উধাও।

গরিলাদের এই পরিবারটি তাদের রীতি অনুযায়ী গতকাল এখানেই বাসা বেঁধেছে। সবচেয়ে বয়স্কা গরিলা চিৎ হয়ে শুয়ে বোধহয় বিরক্তিতে দু'-একবার চোখ খুলেই আবার বুজে ফেলল। ছোটরা নিজেদের মধ্যে হুটোপাটি, খেলা-খেলা মারামারিতে দিব্যি মেতে আছে। মানুষের মতোই গরিলাদেরও ছোটদের এমন দৌরাত্ম্য দেখে ভালো লাগে। হুটোপাটি করতে করতেই কখনও কখনও কেউ কেউ মা-র গায়ের ওপর এসে শুয়ে পড়ছে। মা-র বুক দখল করতে রীতিমতো ঠেলাঠেলি চলছে। কেউ কেউ আবার খুশির চোটে গাছের ডালে উঠে যাচ্ছে। প্রতিটি নড়াচড়া, হাঁটাচলা, ডিগবাজি, হুটোপাটি হুবহু ক্যামেরায় ধরে রাখতে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে আছি, এমন সময় লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখলাম পেশিবহুল ভারী ও বিরাট চেহারার একটা গরিলা দাপটের সঙ্গে হেঁটে বাঁদিকের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। তার পিঠে মোটা রুপোলি দাগ। শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গরিলার পিঠেই এই দাগ দেখা যায়। এ-ই এদের দলপতি। শুনলাম এর নির্দেশেই দলের রোজকার যাত্রাপথ, গন্তব্য ইত্যাদি স্থির হয়।

কতক্ষণ কেটেছে জানি না। হয়তো পনেরো মিনিট, হয়তো আধঘণ্টা। একসময় গরিলার দল উঠে কাছাকাছি গাছগুলোয় চড়ে গাছের ডাল টেনে নিয়ে তার পাতা ছিঁড়ে খেতে লাগল। কখনও একহাতে, কখনও দু'হাতে। কখনও এ ডালে, কখনও ও ডালে। মা যখন চলতে শুরু করে, তার বাচ্চাও তখন হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে তার পিঠে চড়ে দু'হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে। মা দু'পায়ে দাঁড়ালে, বাচ্চা পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে আরও জোরে মাকে ধরে থাকে। মা গাছের পাতা পাড়তে

সোজা হলে, বাচ্চা তার পিঠ ছাড়বে না।

গরিলা পরিবার ক্রমশ আরও ঘন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। আমরাও যে যার নিজের মতো তাদের পিছন পিছন সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। গরিলারা দু'বার আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে খানিকক্ষণের চেষ্টায় আবার একসঙ্গে তাদের একাধিক সদস্যকে দেখতে পাই। একবার খুঁজতে খুঁজতে যখন দেখা পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তখনই গরিলা-বিশেষজ্ঞের সহায়তায় আমাদের ছ'জনের দলের হঠাৎই এক গরিলা-পরিবার দর্শনের শেষে যখন বলা হল, এখান থেকে যাঁরা ফিরে যেতে চান, তাঁদের জঙ্গলের বাইরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে, আর যাঁরা এরপর একা একা গরিলার সন্ধানে জঙ্গলে থাকতে চান, তাঁরা থেকে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, আমি দ্বিতীয়টি বেছে জঙ্গলে রয়ে গেলাম। বনে একা গরিলার খোঁজে খালি হাতে এগোনই ভালো। ক্যামেরাটা অন করে আমার সেই ভালো মানুষ মাথামোটা গাইডকে সামনের দিকে আমার গতিপথ তাক করে শুধু ধরে থাকার নির্দেশ দিলাম। দিয়ে আমি জঙ্গল টুঁড়ে বেড়াতে লাগলাম। এই পর্বটি সে ভালোভাবেই পালন করেছিল, ফলে রোয়ান্ডায় আমার গরিলার সন্ধানে ভ্রমণচিত্রে আমাকে কিছুক্ষণ অন্তত জঙ্গলের মধ্যে একা ঘুরতে দেখা যায়। এ কী তার কম অবদান!

রোয়ান্ডার জঙ্গলে পাহাড়ি গরিলা দেখা নিয়ে আলাদা একটা ভ্রমণচিত্র বানাতে হচ্ছে, ফলে এখানে গরিলাদের নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলব না। তাছাড়া খুব দ্রুত দুপুরের খাওয়া সেরেই আজ সন্ধের আগে পৌঁছতে হবে গিসেইনি। সেখানে দীর্ঘ কিভু হ্রদের তীর ধরে দেখব রোয়ান্ডার আরেক রূপ। পরদিন সেখান থেকে যাব নিউনদো গ্রামে রোয়ান্ডার সাবেক নৃত্যগীত দেখতে। আফ্রিকার নানা দেশে নানা উপজাতির লোকনৃত্য আমি দেখেছি, কিন্তু গরিলাদের জঙ্গলে ঢোকার মুখে সাবাইয়িনো পাহাড়ের পাদমূলে রোয়ান্ডার আবহমানকালের এই দুর্দান্ত নাচগান আফ্রিকায় আগে কখনও দেখিনি। যেমন দাপটের ছন্দতাল, তেমনই লাবণ্যের দীপ্তি। নিউনদো যাব, কেননা এই গ্রামেই এই নৃত্যগীতিশিল্পীদের বাসা। তাদের নিজেদের জন্মগ্রামে তাদের দেশের নাচগান না দেখলে কি কোনও দেশ-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়?

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর, ২০১২